লোক প্রশাসন সাময়িকী দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯১ চৈত্র ১৩৯৭

জাতীয় উন্নয়নে লোকজ মাধ্যমের ব্যবহারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ডঃ মোহাম্মদ হাননান

১.০. আজকের দিনে জাতীয় উন্নয়ন অর্থই হচ্ছে উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। আধুনিক পরিকল্পনবিদগণ এই অংশগ্রহণের অর্থ শুধুমাত্র উন্নয়ন কাজে অংশ নেওয়ার কথাই বোঝেন না, উন্নয়নের মূল পরিকল্পনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও কামনা করেন। তারা বলেন, উন্নয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেহেতু জনগণ, সেহেতু জনগণের কাছ থেকেই জানতে হবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণ ঠিক কিভাবে অংশ নিতে চায় এবং নিজেদের কি কি প্রগতিমুখী পরিবর্তন তারা কামনা করে।

১.১. জনগণের এই মনোভাবকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো এবং তার সামগ্রিক ফললাভের নিশ্চয়তা থেকে যে প্রক্রিয়ার জন্ম, তা থেকেই উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্বের জন্ম। প্লেটোর একটি সুন্দর উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত স্মতর্ব্য । তিনি বলেছেন, 'Communication is winning of men's mind' – অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করার প্রক্রিয়াকেই প্লেটো 'যোগাযোগ' বলতে চেয়েছেন। আজকের দিনে উন্নয়ন যোগাযোগে এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে? কারণ যে কোনো কার্যসিদ্ধির মৌলিক কাজ হচ্ছে, মানুষের মনের মধ্যে প্রথমে বাসা বাঁধা। আর এই কাজটিতে সফল হতে পারলে– 'জনগণের দ্বারা, জনগণের এবং জনগণের জন্যে' যে উন্নয়ন, তাতে জনগণেরই পূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে।

১.২. জনগণের এই অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ম্যাকব্রাইড কমিশনের প্রতিবেদন খ্যাত-'Many

voices, one world'[১] গ্রন্থে ৮ প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপঃ–

১. সংকেত ও শব্দ মাধ্যম
২. ভাষা মাধ্যম
৩. লেখা ও পড়া মাধ্যম
৪. ডাক ও টেলিফোন মাধ্যম
৫. গোষ্ঠী ও স্থানীয় মাধ্যম
৬. উপগ্রহ মাধ্যম
৭. কম্পিউটার মাধ্যম, এবং
৮. গণমাধ্যম ব্যবস্থা।

৩৩৩ পৃষ্ঠা সংবলিত তথ্য ও গণযোগাযোগ জগতের বিখ্যাত প্রতিবেদন ম্যাকব্রাইড কমিশনের এই গ্রন্থে গণযোগাযোগের অত্যাধুনিক (উপগ্রহ, স্যাটেলাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি) মাধ্যমের কথা উল্লিখিত হলেও উন্নয়ন যোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

১.৩. বর্তমান দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহের তো বটেই, অনুন্নত, অর্ধউন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশ সমূহেরও উন্নয়ন যোগাযোগের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে লোকজ মাধ্যম। লোকজ মাধ্যম হচ্ছে সেই মাধ্যম, যা চিরায়ত, হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং যার বসতি হচ্ছে সাধারণ জনগণমনে। এই মাধ্যম অনানুষ্ঠানিক, দ্রুত আয়াসসাধ্য এবং সাধারণ মানুষের কাছকাছি। সাধারণের মন থেকেই তা উৎসারিত এবং বিরাজিত।

১.৪. আজকের দিনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়ায় ইলেকট্রোনিক্স গণমাধ্যমের পরিপূরক হিসেবে শুধু নয়, লোকজ মাধ্যম অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ায় গণযোগাযোগে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত এবং অধিক ফলদায়ক ও দ্রুত 'সহৃদয় হৃদয়সংবেদী'। বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বাংলাদশে আর্থ –সামাজিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিচয়

২.১. বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী নীচের দিক থেকে পঞ্চম–দরিদ্র দেশ হিসেবে স্বীকৃত।[২] আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দুই অধ্যাপক জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে, পারকিনন্স বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের প্রবল নৈরাশ্যই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে রচিত গ্রন্থে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে একটি কঠিনতম সমস্যা। যদি কখনো বাংলাদেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবীর যে কোন দেশের উন্নয়নই

সম্ভব। তাঁরা আরো বলেছিলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই জন্যে তাঁদের যৌথ প্রকাশনার নামও তাঁরা দিয়েছিলেন, 'বাংলাদেশ দি টেষ্ট কেইস অব ডেভেলপমেন্ট'।[৩]

২.২. বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের দুই সাবেক কর্মকর্তার এই মতপ্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের বহুল কথিত–'বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ' মন্তব্য থেকেও হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই আন্তর্জাতিক অভিমতগুলি উদ্ধৃত করা হল ' উন্নয়নশীল দেশ' বলে কথিক এই দেশটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য।

২.৩. এই প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাদশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান নেওয়া যেতে পারে। এদেশর জনসংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক দশ কোটিরও বেশী। প্রতি বর্গমাইলে ১৯১৭ জন (১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী) লোকের বাস।[৪] মোট জনসংখ্যার ১৫·২% ভাগ মাত্র শহরে বাস করে, বাকী ৮৪·৮% ভাগ জনসংখ্যারই বাস গ্রামে।[৫]

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ
সংখ্যা(০০০)

মোট জনসংখ্যা	শহর	গ্রাম
৮৯,৯১২	১৪,০৮৯	৭৫,৮২৩

বাংলাদেশ ঃ জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক অবস্থা [৬]
সংখ্যা (০০০)

বছর	মোট জনসংখ্য	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	অন্যান্য
১৯৭৪	৭১,৪৭৮	৬১,০৩৯	৯,৬৭৩	৪৩৯	২১৬	১১১
১৯৮১	৮৭,১২০	৭৫,৮৭৪	১০,৫৭০	৫৩৮	২৭৫	২৫০

সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪ টি জেলা, ৯০ টি পৌরসভা ৪৬০টি উপজেলা, ২৭টি থানা, ৪৪০১টি ইউনিয়ন, ৪৫৩টি ওয়ার্ড, এবং ৬০,৩১৫টি গ্রাম রয়েছে। দেশটিতে কৃষি শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৭·৫ মিলিয়ন এবং অকৃষিজীবী শ্রমিকের সংখ্যা ১৩·১ মিলিয়ন। [৭]

বাংলাদেশ ঃগ্রাম ও শহরের শ্রমজীবীর সংখ্যা [৮]

সংখ্যা (০০,০০০)

বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৮৫–৮৬	৩০·৯	৪·৭	২৬·২

বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার ২৩·৮%।

গ্রাম ও শহরে বাংলাদেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা [৯]

১০ বছর ও তদুর্ধ (হাজারে)

এলাকা	মোট জনসংখ্যা	নিরক্ষর লোকের সংখ্যা	শতকরা হার
বাংলাদেশ	৫৮,১৬৯	৪১,৬৩৯	৭১·৬
শহর	৯,৪৯৯	৫,০৭৫	৫৩·৪
গ্রাম	৭৮,৬৭০	৬৬,৫৬৩	৪৬·৫

২.৪. উপরের উপাত্ত থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ আর্থ–সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ একটি দেশ যার অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল, শিক্ষার হার কম,অথচ সমস্যার পাহাড় দেশের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অথর্ব করে রেখেছে। এই রকম একটি অবস্থার দেশে জাতীয় উন্নয়নে যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিস্থিতি

৩.১. বাংলাদেশের ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের মধ্যে বেতার (রেডিও) সবচেয়ে জনপ্রিয়। অশিক্ষা ও ধর্মীয় গোড়ামীতে আকীর্ণ বাংলাদেশের সমাজে বেতারযন্ত্র তাঁর আবিষ্কারের যুগে 'যাদুর বাক্স' বলে অভিহিত ছিল এবং এই ধরনের একটি বাক্স থেকে কথা বের হতে পারে এমন বিশ্বাস আনলে ঈমান[১০] হারানোর শঙ্কা করা হতো, এবং ধর্মীয় বেত্তাদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে কড়া ফতোয়াও জারী হয়েছিল।

৩.২. বিশ্বাসের এমন একটা অবস্থা থেকে আজ বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে বেতার বাংলাদেশে সবচেয়ে সুলভ গণসম্প্রচার হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিগুণে বেতার এখন পকেট সাইজে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তুলনামুলকভাবে এই যন্ত্রটি সস্তাও। কৃষক জমিতে লাঙ্গল চষছে এবং জমির আলের কাছে বেতার যন্ত্র বাজছে– এমন চিত্র বাংলাদেশে খুব সুলভ না হলেও একেবারে অদৃশ্য নয়। বর্তমানে

সমগ্র দেশে বাংলাদেশ বেতার তার মোট ৬টি কেন্দ্র মিলে দৈনিক ৮২-৮৩ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে।

৩.৩. বিভিন্ন কার্যক্রমে এর সময় ভাগ নিম্নরূপঃ[১১]

বেতার অনুষ্ঠান	সময়	
জনসংখ্যা কার্যক্রম	দৈনিক	১৯৫ মিঃ
স্বাস্থ্য কথা	দৈনিক	৭৫ মিঃ
কৃষি কথা	দৈনিক	২৫মিঃ
শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান	দৈনিক	২৪০ মিঃ
সৈনিকদের জন্যে অনুষ্ঠান	দৈনিক	২৪৫ মিঃ
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	দৈনিক	৫৭০ মিঃ

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের বেতার কার্যক্রমের এই সময় বিভাগ উন্নয়ন যোগাযোগে একটি প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ কৃষি দেশের অর্থনীতির মুল স্তম্ভ হলেও এর জন্যে দৈনিক মাত্র ২৫ মিঃ ব্যয় করা হয়। দেশটি শিক্ষায় অনগ্রসর হলেও সপ্তাহে এর জন্যে যেখানে ২৪০ মিনিট বরাদ্দ হয়,সেখানে সৈনিকদের জন্যে বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হয় ২৪৫ মিনিট। শুধু তাই নয়, উন্নয়নশীল দেশে বেতারযন্ত্রে গণযোগযোগের মাধ্যমে, জনকল্যাণই এর যেখানে মূল লক্ষ্য, সেখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ৫৭০ মিনিট ব্যয় করা মানেই, তাকে মুনাফালাভী প্রতিষ্ঠানের মতো দেখা হচ্ছে, অথবা ব্যবহার করা হচ্ছে। এর যে সামাজিক দায়িত্ব আছে, এই ব্যবসায়িক মনোভাব তা থেকে বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে।

৩.৪. অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাঠকর্মীরা সহজেই পকেটে বেতার যন্ত্র সাথে রাখতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী উন্নয়ন 'বার্তা /'মেসেজ' জনগণের কাছে পৌছে দিতে পারে। এক সময় ছিল (ষাটের দশকের শেষ দিকে এবং সত্তর দশকের, প্রথমার্ধে) ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কৃষি কথার আসরের 'মজিদের মা ' শীর্ষক একটি চরিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং এর মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় জরুরী 'মেসেজ' সরাসরি জনগণের কাছে পৌছানো হোত। কিন্তু এরপরও মেসেজ পৌছানোর ক্ষেত্রে বোতারযন্ত্র বাংলাদশে সর্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি।

৩.৫. বেতার যন্ত্রকে দেশের মানুষের কাছে সুলভ করতে হবে। প্রতিটি হাট ও বাজারে,চৌরাস্তার মোড়ে, স্কুল ও কলেজে বাক্স করে সংরক্ষিত অবস্থায় বেতার যন্ত্র রাখা এবং জাতীয় স্থানীয় সংবাদ বুলেটিনের সময় অথবা জরুরী বার্তা অনুষ্ঠান কিংবা উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের সময় তা এক যোগে চালু করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, বেতার একটি ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যম হলেও সুলভতার কারণেই তা গ্রামের মানুষের কাছে একটি লোকজ উপাদানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। গ্রামে

এখনো বিয়ের অনুষ্ঠানে আলতা শাড়ীর সাথে একখানি বেতার যন্ত্র বর-কনের যৌতুকের সামগ্রী হিসেবে চাহিদা-পত্রে সন্নিবেশিত থাকে।

টেলিভিশন

৪.১. দারিদ্র পীড়িত ও অশিক্ষিত গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে টেলিভিশন এখনো একটি অত্যাশ্চর্য বিষয়। বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে টেলিভিশনের রঙিন যুগে পদার্পণ এই বিষয়ে আলাদা ব্যঞ্জনা ও অভিযাতের জন্ম দিয়েছে। ষাটের দশকের মাঝ থেকে বাংলাদেশে টেলিভিশন জন্ম নিলেও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের এই চোখ ও মন মোহিনী যন্ত্রটি এখনো একটি অভিজাত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। মধ্যবিত্ত শহুরে প্রায় সব ঘরে টেলিভিশন থাকলেও গ্রামে প্রধানভাবে সমৃদ্ধ পরিবারের একটি আসবাব এটি। খুব কম গ্রামেই এখনো টেলিভিশন সুলভ। হাট-বাজারের কাছাকাছি অবস্থিত ক্লাব, সমিতি বা এই জাতীয় অন্যান্য সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাটারী চালিত টেলিভিশন বাংলাদেশে খানিকটা প্রতুল।

৪.২. বাংলাদেশে টেলিভিশন সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর অভিযাত শিশু মনে অত্যন্ত গভীর রেখা পাতের ঘটনা থেকে এই সম্পর্ক মূল্যায়ণ করা সম্ভব যে, যদি গ্রাম পর্যায়ে টেলিভিশন সুলভ করে তোলা যায়, তাহলে এই মাধ্যমে যে কোনো রসাশ্রিত উন্নয়নমূলক 'মেসেজ' সহজেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্র

৫.১. মুদ্রণ মাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রায় দুইশত বছর পূর্ব থেকে এদেশে সংবাদপত্র গণমাধ্যমেব প্রচলন শুরু হয়। তবে নিরক্ষরতা প্রধান বাংলাদেশের খুব কম লোকই এই মাধ্যমের প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভে সক্ষম। মূলতঃ এই দেশের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্যে গণমাধ্যমের এই বিশেষ দিকটি প্রধানভাবে কার্যকর।

৫.২. কারণ যে দেশের দশভাগের নয় ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে, চার ভাগের তিনভাগের বেশী মানুষ যেখানে অশিক্ষিত, পাঁচ ভাগের চার ভাগ বাস করে দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং একটি রুটির দাম যেখানে একটি সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী, সেখানে গণযোগাযোগের বাহন হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা খুব যৌক্তিক কারণেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৫.৩. তবে সংবাদপত্র নিয়মিত পড়ে বা পড়তে পারে এমন লোকের কাছ থেকে ধারাবাহন ('ডিকোড') হয়ে সংবাদপত্র পরিবেশিত তথ্য বা 'মেসেজ' সাধারণ নিরক্ষর

সমাজে বিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ অঞ্চলে রয়েছে। সেদিক থেকে গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আওতাধীন গণমানুষের সংখ্যা বিস্তৃত।

৫.৪. কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদপত্র নিজেই গণযোগাযোগে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করে রেখেছে। ১৯৮১ সালে প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ–এক জরীপ চালিয়ে দেখেছে যে, বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলি তাদের পাতার দশভাগের একভাগও গ্রামে বসবাসকারী নব্বই শতাংশ মানুষের জন্যে ব্যয় করতে কুন্ঠিত হয়। সংবাদপত্রগুলি তাদের পাতার কুড়ি ভাগের একভাগ অংশ মাত্র মফস্বল সংবাদের জন্যে বরাদ্দ রাখে। জরীপের পরিস্যখ্যানে এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম দৈনিক 'সংবাদ।[১২]

৫.৫. শুধ্ বাংলাদেশ নয়, একই সংস্থার আরেকটি জরীপে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অধিকাংশ সংবাদপত্রই এই ধারা ও নীতিমালা বিশিষ্ট 'শিল্প' বলে পরিচিত। সংস্থাটির জরীপে দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশে ১৯৮৩ সালের ৮টি সংবাদপত্র পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে অর্থনীতি, বাণিজ্য, কৃষি ও শ্রম বিষয়ক উন্নয়ন মূলক গুরুত্ব সম্পন্ন সংবাদ সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, প্রতিনিধিত্বমূলক এই সব সংবাদপত্রে শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন সংবাদ(মেসেজ)–ই এই সময় প্রকাশিত হয়নি।[১৩]

৫.৬. বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলির অবস্থা আরো করুণ। আঞ্চলিক সংবাদপত্রের দেশে দেশে লোকজ মাধ্যমের অন্যতম উপায় ও উপাদান হিসেবে বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশে তা একান্তই ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি আঙ্গিক ও সংবাদপ্রবাহ, এই দুই দিক থেকেই নিম্নমানের। প্রধানত স্থানীয় প্রাওপাও, বিজ্ঞাপন, ও নিউজপ্রিন্টের ব্যবসা করার জন্যেই বাংলাদেশের আঞ্চলিক অথবা মফস্বল সংবাদপত্রগুলি ব্যস্ত। গ্রাম বাংলা বা গ্রামীণ মানুষ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে এতে ধরা পড়ে না

৫.৭. এখানকার আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি মুলতঃ শহরকেন্দ্রিক এবং শহরমুখীও। প্রধানভাবে রাজনৈতিক বিষয় ও চলচ্চিত্র ভাবনাই এই সব পত্র–পত্রিকার মুখ্য উপাদান হয়ে আসে। স্থানীয় সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়নের দিকগুলি বস্তনিষ্ঠভাবে খুব কমই স্থান পায়।

৫.৮. স্থানীয় লোকজ মাধ্যমগুলিকে উচ্চকিত করে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি যে ভূমিকা পালন করতে পারতো, তা এভাবেই অপব্যবহৃত হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। অবশ্য বিজ্ঞাপন বন্টনে সরকারী নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা থাকার কারণেও আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি 'কোমর সোজা' করে দাঁড়াতে পারছে না।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে লোকজ অবস্থা

৬.১. বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার লক্ষ লক্ষ কর্মী রয়েছে যারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামের মানুষের সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখে। সরকারের কৃষি বিভাগের মাঠকর্মী এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের জনসংখ্যা কর্মীরা কৃষক ও দম্পতিদের সাথে সরাসরি কথা বলে থাকে এবং সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা সিনেমা ইউনিট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভ্রাম্যমান চলচিত্র প্রদর্শনী করে থাকে। প্রদর্শন শেষে খন্ড সভা করে উন্নয়নমূলক কথামালা প্রচার এদের মুল কাজ।

৬.২. এইসব মাঠকর্মী ছাড়াও বেসরকারী সংস্থা সমূহের কর্মীরাও গ্রামীণ মানুষের নিত্যদিনের উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে কয়েক হাজার বেসরকারী সংস্থার লক্ষাধিক মাঠকর্মী এই কাজে ব্যপৃত রয়েছে।

৬.৩. কিন্তু এই প্রকার মাঠকর্মীরা যে কাজে ব্যাপৃত আছে, তাতে মনে হয় তারা প্রধানত 'চাকুরী' করে। অথচ যে দেশপ্রেমমুলক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে তারা আংশীদার তা কেবলমাত্র 'চাকুরী করা মনোভাব' দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এই জন্যে মাঠকর্মীদের মুল সংগঠন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক অঙ্গীকার দরকার– যা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

৬.৪. মাঠকর্মীরা সরাসরি জনগণের কাছে যাবে এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে। এভাবে একজন মাঠকর্মী জনগণের মতামতকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ পায়। গণযোগাযেগের সুবিধাই এখানে। বাংলাদেশে এই কাজগুলি করার জন্যে সরকারী জনসংখ্যা মাঠকর্মী, কৃষি বিভাগের মাঠকর্মী, তথ্য বিভাগের মাঠকর্মী রয়েছে। কিন্তু যোগাযোগ সফলভাবে বাস্তবায়নে যে ধাঁচের প্রশিক্ষিত রাজনৈতিক–সামাজিক অঙ্গীকারের সিভিলিয়ান দরকার এখানে তার অভাব রয়েছে। ফলে লোকজ মাধ্যম গুলিও এদের যথাযথ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

বাংলাদেশের লোকজ মাধ্যম পরিস্থিতি

৭.১. আদিম মানুষ গুহা গাত্রে চিত্র এঁকে রাখতো জ্ঞাপন বা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে। গণযোগাযোগে লোকজ মাধ্যমের উদ্ভব এখান থেকেই। বিভিন্ন ধ্বনি, সংকেত, নৃত্য ইতাদির মাধ্যমে আদিম মানুষ তাদের তথ্যপ্রচার এবং এ থেকে আরদ্ধ কাজ সম্পন্ন করতো। বিনোদনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেদিক থেকে লোকজ মাধ্যমের এই আদিম কৌশল হচ্ছে সকল প্রকার গণযোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম।

৭.২. আধুনিক মানুষের সমাজ জীবন ও বৈষয়িক প্রবৃত্তি আগের সেই গন্ডীতে নেই,এমনকি যুগে যুগে সাংস্কৃতিক গতিধারার ঐতিহ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এতোসব পরিবর্তন, পরিক্রমণের পরও লোকজ মাধ্যমের গুরুত্ব ও মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেনি।

৭.৩. বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যশালী এবং হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দেশ। এ দেশের অকৃত্রিম সংস্কৃতি জগৎ একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হাতিয়ার। গণমানুষের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির লোকজ ধারা তার সার্থক প্রতিফলন।

বাংলাদেশের লোকজ মাধ্যমের বিভিন্ন দিক এ প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা যেতে পারেঃ–

(ক) যাত্রা ঃ

এক বিশেষ ভঙ্গীতে পরিবেশিত নাটক ধাঁচের একটি শিল্প মাধ্যম এটি। অনুষ্ঠান স্থানের একবারে মাঝখানে মঞ্চ থাকে, দর্শক –শ্রোতা এর চার পাশে ঘিরে বসে যাত্রা উপভোগ করে। কুশলীরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে।

মূলতঃ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী নিযে যাত্রার প্লট রচিত হয়। যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা একটু কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগ করে আবেগ–আপ্লুত অভিনয় করেন বলে তা জনগণের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে যাত্রা ছিল আদিম দিনের বিনোদন মাধ্যম। যখন কাজ–কর্ম থাকেনা তখন সারারাত জেগে যাত্রা দেখে জনসাধারণ দিনভর ঘুমে বিভোর থাকতো। যাত্রায় নাটকীয় কাহিনীর মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের সুখ–দুঃখের গান অথবা 'বিবেকের' গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে এই সময়টি 'সঠিক সময়' ('পিক–আওয়াজ') বা 'উপযুক্ত সময়' বলে বিবেচিত হয়। এই সময়টায় দর্শক–শ্রোতা গভীর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে।

জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মৌলিক বিষয়গুলি রসাত্মক ভঙ্গিতে অথবা গানের মাধ্যমে এই সময় জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। অথবা উন্নয়ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতেও যাত্রার কাহিনী রচিত হতে পারে। তাতে অভিনয় ও যাত্রামঞ্চ সজ্জার স্বার্থে ঐতিহাসিক বিষয় জুড়ে দিলেই চলবে। এতে উপস্থিত সমগ্র গ্রামবাসী দেশগঠনে তাদের ভূমিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জনমত গড়ে তুলতে সাহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(খ) *মুক্তনাটক বা পথনাটক:*

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্তনাটক বা পথনাটক শিল্প শহর ছেড়ে গ্রাম পর্যায়ে যাত্রা শুরু করেছে। এর উদ্যোক্তা প্রধানভাবে রাজনৈতিক কর্মীরা হলেও জাতিগঠন কাজে সরকারী –বেসরকারী পর্যায়েও তা শুরু করা যায়। কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রমে অবশ্য ইতিমধ্যেই তা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এই মাধ্যমটি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাধারণভাবে নাটকের জন্যে যে বিশেষ মঞ্চ ও পোষাক ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, পথনাটক বা মুক্তনাটকে তা প্রয়োজন হয় না। কাহিনী 'হিসেবেও যে ঘটনাটি এখানে মঞ্চস্থ হয়,তাও কোনো প্রখ্যাত বা জনপ্রিয় নাট্যকারের লেখা থাকেনা। স্থানীয় কোনো ঘটনা বা কাহিনী যা সম্প্রতি ঘটেছে (সাধারণভাবে) তা স্থানীয় কোনো কম শিক্ষিত যুবক বা তরুণই লিখতে পারে এবং স্থানীয় যুবক–তরুণ বা যে কোনো বয়সের নাট্যমোদী এতে অভিনয় করে।

পথনাটক বা মুক্তনাটকের বিশিষ্টতা হল, আনুষ্ঠানিকতার বাহুল্য না থাকায় খুব সুলভেই একটা বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে আয়নার মতো অথবা বলা চলে স্ফটিকের জলের ন্যায় জনগণের সামনে বিষয়টির গুরুত্বসহ ধরা পড়ে এবং সম্মিলিতভাবে জনগণের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মূল বিশেষত্ব এখানেই, অংশীদারিত্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজেদের সক্রিয় উপস্থানায় পরিস্ফুটিত হয় এবং প্রভাব হয় সুবিস্তৃত এবং সুকৌশলী।

(গ) *কবিগান, জারীগান, শারীগান:*

এই সঙ্গীত দলগুলি বাংলার জাতীয় লোকজ সম্পদ এবং গ্রাম বাংলার প্রাণ ভ্রমরা। আজো সমগ্র পল্লীবাংলাকে এরাই জাগিয়ে রেখেছে। সারা দিনভর অবিরাম খাটুনির পর সন্ধ্যায় জারী, শারী, কবিগানের জলসায় গ্রামের মানুষকে আনন্দের প্রাচুর্যে আপ্লুত করে তোলে।

কবিগান মূলতঃ দুইজন গ্রামীণ কবির সুরেলা কবিত্বের লড়াই। তাঁরা দু'জন সুমতি ও কুমতির প্রতীক হিসেবে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লড়াই করে। এদের একজন ভালর পক্ষে থাকে এবং ভাল'র বিভিন্ন দিক দর্শক–শ্রোতার কাছে তুলে ধরে। অন্যজন মন্দের পক্ষে থাকে এবং মন্দের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাল–মন্দের লড়াইয়ে ভাল'রই জয় হয় এবং দর্শক–শ্রোতা অফুরন্ত আবেগে করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করে। জারী ও শারীগানও অনেকটা তাই–তবে এই ক্ষেত্রে মূল গায়েনের সাথে আরো সহযোগী গায়েন (যাদের 'দোহার' বলে) সুরে সুরে 'ধুয়া' তোলে। এইসব ক্ষেত্রেও দুটো পক্ষ থাকে, তবে নাও থাকতে পারে।

বৃটিশ ভারতে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গায়েন কবিয়ালরা অত্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। কবিয়াল রমেশ শীল এবং মুকুন্দ দাশের গান বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেদিক থেকে বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কার্যকক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করতে এই সব কবিগান, জারী ও শারী গানের কোনো বিকল্প নেই।

(ঘ) *গম্ভীরা গানঃ*

এই জাতীয় গান মুলত ঃ রাজশাহী অঞ্চলে অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় গানের ধারা। গম্ভীরা গানে একজন 'নানা' এবং একজন 'নাতী' চরিত্র থাকে। এই নানা নাতীর সুরেলা আঞ্চলিক কথার লড়াইয়ে একটি বিষয় উপস্থাপন করা এবং সুরে সুরে বারবার একটি লাইন 'নানাহে–' উচ্চারিত হয়। ইদানীং গম্ভীরা গানকে জাতীয় গঠন মূলক কাজে ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন 'স্বনির্ভরতা' বিষয়ে গম্ভীরা গানকে ব্যাপক ব্যবহার করে খ্যাতি অর্জন করেছে।

(ঙ) *পালাগানঃ*

এটি একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠান। গ্রামের মানুষ এই গানের অনুষ্ঠানকে হৃদয়–মথিত করে উপভোগ করে। রাধা –কৃষ্ণ, রূপাবান, বেহুলার পালা অত্যন্ত প্রিয় পালাগানের আসর বলে পরিচিত। সাধারণভাবে সন্ধ্যার পর গ্রামের নারী–পুরুষ গৃহকর্ম সেরে বড় কোনো উঠোনে এই পালাগানের আসর সাজিয়ে তোলে।

উন্নয়ন –পালার গান রচনা করে এই লোকজ মাধ্যমটিকেও সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

(চ) *পুঁথি পাঠঃ*

অনেকটা ঘরোয়া বৈঠকে, উঠোনে বসে পুঁথি পাঠ বাংলাদেশের জনপ্রিয় মুসলিম বিনোদন অনুষ্ঠান। প্রধানত মুসলমানদের প্রিয়নবী এবং কারবালার ঘটনা (হাসান–হোসেনের মর্মান্তিক কাহিনী) নিয়ে রচিত পুঁথি পাঠ জনগণের মনকে করুণভাবে আন্দোলিত করে।

এই জনপ্রিয় মুসলিম অনুষ্ঠান রীতিটিকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আধারে বিন্যাস করা সম্ভব। ধর্মীয় চেতনার আলোকে জনসংখ্যা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যাবলীর মৌলিক দিক জনগণের কাছে ফুটিয়ে তুলে হৃদয়গ্রাহী করে উদ্বুদ্ধ করা সহজসাধ্য হবে বলে বিবেচনা করা যায়

(ছ) *পুতুল নাচঃ*

একটি লোকজ, কিন্তু আধুনিক আঙ্গিক বিন্যাসে রূপায়িত পুতুল নাচ ও জাতীয় উন্নয়ন ধারায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু গ্রাম বাংলায় নয়, শহুরে শিক্ষিত সমাজেও ছেলে-বুড়ো সকল পর্যায়ে-পুতুল নাচ জনপ্রিয় তার অঙ্গভঙ্গিময় বিশিষ্টতায়। ইতিমধ্যেই পুতুল নাচের বহুল ব্যবহার সফলতা লাভ করেছে।

পুতুল নাচকে এই পর্যায়ে গ্রামবাংলায় সরাসরি প্রদর্শনীতে এনে জাতীয় উন্নয়নের তথ্য প্রদান শিক্ষাদান কর্মসূচীতে আনা সম্ভব।

(জ) *পটঃ*

লোকজ মাধ্যমের অন্যতম উপদান পট শিল্প এখন লুপ্ত হতে বসেছে। অথচ একসময় 'গাজীর পট' নামে গ্রাম বাংলায় মানুষের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত।

একটি বড় কাপড়ের উপর বিভিন্ন কাহিনীর খন্ডচিত্র একে পটুয়ারা তা নিজস্ব সুরে ঘটনাকে বিবৃত করতে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী থেকে শুরু করে গাজী কালু -চম্পাবতীর কাহিনী পটে আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এই লোকজ মাধ্যম বাংলাদেশে এখন একেবারে বিস্মৃত এমন কথা বলা যাবে না। এখনো ফুটপাতে ও হাটে-বাজারে গ্রাম্য ঔষধ বিক্রেতারা পটে বিভিন্ন ছবি এঁকে ঔষধ বিক্রি করে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক, এর প্রয়োজনীয়তা, এর থেকে জনগণের কি কি উপকার হতে পারে, জনগণ এর বাস্তবায়নে কিভাবে অংশ নিতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি পটে এঁকে রাস্তায় কিংবা হাট-বাজারে উঁচু জায়গায় টানিয়ে দেওয়া যায় অথবা একজন মাঠকর্মী বক্তৃতা দিযে তা বুঝিয়ে দিতে পারে অথবা উপযুক্ত গায়েন পটুয়া নিয়োগ করে তা সুরেলা কন্ঠে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে প্রচারের মাধ্যমে গণযোগাযোগের উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে।

(ঝ) *ভোজ বাজি :*

একই ভূমিকা নিতে পারে এই লোকজ মাধ্যমটি। আধুনিক যাদুবিদ্যা এই গ্রামীণ সংস্করণ 'ভোজাবাজি' থেকেই বিকাশ লাভ করছে।

ভোজাবাজিওয়ালা বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল ও পয়সা তোলে এবং রহস্যময় 'আছে-নাই' খেলা দেখিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে।

জাতীয় সমস্যা-যেমন, গণশিক্ষা অথবা পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে এই বাজিওয়ালাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দিলে জাতীয় উন্নয় কর্মকান্ডে তা সবিশেষ

ভূমিকা পালন করতে পারে। জনমত গঠন প্রক্রিয়ায় তা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(ঞ) *ক্যারাভান:*

লোকজ মাধ্যমের এই বিষয়টি গ্রামবাংলায় এখনো সুলভ। মূলতঃ শোভাযাত্রা সহকারে কোনো উন্নয়ন কর্মকান্ড অথবা অন্য যে কোনো বিষয়কে জনগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার জন্যেই ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান তার ক্ষমতার দশ বছর পূর্তি উৎসব পালন উপলক্ষে ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার করে তথাকথিত 'উন্নয়নের এক দশক' পালন করেছিল। ঢাকা থেকে রেল শোভাযাত্রা করে বিচিত্র রঙ ও চিত্রের ব্যানার সহযোগে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচার কার্যসূচী সম্পন্ন করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘটা করেই ক্যারাভান পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রচলনের সংবাদ আমরা পাচ্ছি।

গ্রামে বড় ধরণের একটি কুমড়ো বা কাঠাল হলে তা হাতির পিঠে চড়িয়ে অথবা ঢোলবাদ্য বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী প্রদর্শন করে টাকা তোলার প্রচলন রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফলতাসমূহ এইভাবে ক্যারাভান পদ্ধতিতে তুলে ধরে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে আরো উদ্বুদ্ব করা যেতে পারে।

(ট) *মেলা:*

বছরের কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম–গঞ্জে মেলা বসে থাকে। দূর–দূরান্ত থেকে বিভিন্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন রকম সওদা নিয়ে মেলায় এসে থাকে। মেলার মৌসুমে জড়ো হয় বিভিন্ন রকম প্রদর্শনীর।

জাতীয় উন্নয়ন ধারা সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য এই মেলাগুলিতে পসরা সাজিয়ে জনগণকে অবহিত করে জনমত সংগঠন করা সম্ভব।

আজকাল এই মেলার অনুকরণেই – কৃষি মেলা, শিল্প মেলা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এ থেকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারে।

(ঠ) *হাট বাজার:*

গ্রামে নিকটস্থ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিনই বাজার বসে এবং সপ্তাহে এক বা দুইদিন হাট বসে থাকে। নানা গ্রামের মানুষ এই সময় বেচা –কেনা করতে এই সব যায়গায় সমবেত হয়।

ভিয়েতনাম তার বিপ্লবের পর গণশিক্ষা কার্যক্রম চালাতে গিয়ে হাট–বাজারকে ব্যবহার করে সফলতা অর্জন করে। হাট–বাজারের চারদিকের প্রবেশ পথে বড় করে বর্ণমালা লিখে 'সাইনবোর্ড' টানিয়ে রাখা হতো। গণশিক্ষা কর্মীরা জনগণকে

প্রবেশ পথে একবার এবং প্রস্থান করার সময় একবার সাইনবোর্ডের সামনে নিয়ে যেতে এবং একবার করে প্রথমে থেকে শেষপর্যন্ত বর্ণমালা পড়তে বাধ্য করতো। এমনি করে মাসের পর মাস এই কার্যক্রম নিয়মিত গতিতে চালু থাকায় ভিয়েতনাম গণশিক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য সফলতা অর্জন করে।

বাংলাদেশেও গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করতে এই রকম হাট–বাজারকে ব্যবহার করা যায়। প্রধানভাবে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে অধিক সফলতা অর্জন করতে এই লোকজ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা অধিক যুক্তি সঙ্গত হবে।

জাতীয় সমস্যাগুলির অন্যান্য সমাধানেও হাট–বাজারকে ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষ করে এই সময় মাঠকর্মীগণ বিভিন্ন খন্ডসভা করে জনমত সংগঠন করার কাজে হাট–বাজারের স্বাভাবিক জমায়েতকে কাজে লাগাতে পারে।

(ড) *খেয়াঘাট*

খেয়া পারাপার বা ফেরী পারাপার করার সময় যে ঘাট ব্যবহার করা হয় সেই সময়ও ক্ষণিকের জন্যে নিয়মিত জমায়েত সংগঠিত হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং এই সম্পর্কে জ্ঞানদান করার ক্ষেত্রে খেয়াঘাটও একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(ঢ) *ওয়াজ মাহফিল:*

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজে ওয়াজ মাহফিল –অনুষ্ঠান করা একটি নিয়মিত ঘটনা। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও ধর্ম কথা আলোচনার জন্যে সারা বছরই ওয়াজমাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ধর্ম কথার সংগে দেশপ্রেম ও জাতিগঠনের কোনো বিরোধ নেই, বরং তা একটি পরিপূরক কার্যক্রম। কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে ব্যাপকভাবে এই বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বরং কোনো কোনো সময় ওয়াজ মাহফিলকে জাতীয় উন্নয় কর্মকান্ড বিরোধী কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সমর্থন করে পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। এই সব উদ্ধৃতির আলোকে জাতীয় আলেম সমাজের মাধ্যমে গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে কুসংস্কারমুক্ত পল্লী সমাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

গ্রামবাংলার এই লোকজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি জাতীয় কর্মকান্ডের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। জাতীয় পরিকল্পনাবিদদেরকে তা গভীরভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ জাতীয় জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে যে কারণে অধিক সফলতা লাভ সম্ভব হচ্ছে না–তাহলো ধর্মীয়ভাবে জনসংখ্যা

নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শত বছরের অপপ্রচার। সুতরাং এই অবস্থা থেকে মুক্তির প্রধান উপায় হচ্ছে, প্রকৃত ধর্মীয় কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং জনগণকে ধর্মীয় ভাবেই জনসংখ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা।

(ণ) *মিলাদ মাহফিল :*

বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি ঘরোয়া মুসলিম অনুষ্ঠান মিলাদ মাহফিল। মুসলমান সমাজের প্রিয় নবীর নামে দোআ ও দরুদ পাঠের জন্যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মিলাদ মাহফিলের জন্মও ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ –বিরোধী নিষিদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্যে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্যে মুসলমান নেতারা ঘরোয়া বৈঠক করে সেই সময় মিলাদ মাহফিলের আড়ালে রাজনৈতিক আলোচনায় বসতেন।

মিলাদ মাহফিলের সময় কতকটা ধর্ম–কথাও আলাপ হয়ে থাকে। এই সময় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও নৈতিকতা সম্পর্কে জাতীয় আলেম সমাজ বক্তব্য রাখতে পারেন। তাহলে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকেই জাতীয় সমস্যাগুলির বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে পারতো। জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা ইসলামী –চেতনার বিরোধী নয়, ধর্মসভায় এই প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা যায় এবং এতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেবে।

(ত) *কৃষ্ণকীর্তন উৎসব :*

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের একটি জনপ্রিয় উৎসব কৃষ্ণকীর্তন। বিভিন্ন পালা –পার্বনে নির্দিষ্ট কতকগুলি স্থানে চিরাচরিত রীতিতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানকে 'মহোৎসব'ও বলা হয়েথাকে।

ভক্ত–হৃদয় বিগলিত করে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই কৃষ্ণকীর্তনে অংশগ্রহণ করে। চিরায়ত এই লোক ধর্মানুষ্ঠানকে জাতীয় উন্নয়নের ধারার সাথে মেলানো সম্ভব। ধর্মকথার সাথে সাথে ভক্তদের মনে উন্নয়ন কর্মসূচীতে তাদের সক্রিয়তার বিষয়টি উথাপন করা যায়।

(থ) *সাপ খেলা :*

বাংলাদেশের বেদের দল কর্তৃক গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনপ্রিয় সাপখেলা প্রদর্শিত হয়। এতে তারা সুরেলা কণ্ঠে 'লখাই –বেউলা' (লখিন্দর –বেহুলা)–র গান করে দর্শক শ্রোতার মন জয় করে।

গ্রাম বাংলায় অত্যন্ত লোকপ্রিয় এই লোকজ অনুষ্ঠাটি জাতীয় উন্নয়ন কর্মধারার প্রচার কার্যে নিয়ে আসা যায়। এতে অতিরিক্ত আর যে কাজটি হবে, তা হল যাযাবর পদ্ধতির জীবনধারী এই সম্প্রদায়কে অনুৎপাদনশীল পেশা থেকে উৎপাদনশীল পেশায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। একই সাথে ঝার, ফুঁক, তাবিজ, সিঙ্গা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর টোটকা চিকিৎসা থেকেও তাদের বিরত রাখা সম্ভব হবে।

(দ)*গ্রাম সভা :*

গ্রাম বা পাড়ায় স্থানীয় ভাবে মাণ্যবর গুরুজন শ্রেণী থেকে এক বা একাধিক মাতব্বর ঐতিহ্যগত ভাবেই থাকেন। দিনাবশেষে পাড়ার নিরক্ষর–অক্ষর সকল শ্রেণীর মানুষের জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় মাতব্বরের বাহির বাড়ীর ঘরে অথবা দহলিজে (একে অনেক জায়গায় 'বাংলাঘর' বলা হয়)। হুক্কা টানতে টানতে সেই জমানো 'আড্ডা বিশেষে' দেশ –গ্রাম পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। অনেক সময় এতে বিচার–সালিশও চলে। মাতব্বরের কথা গ্রামের দশজন শোনে ও মান্য করে।

লোকজ মাধ্যমের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জাতীয় উন্নয়ন ধারার সাথে এই মাতব্বর শ্রেণীর মান্যবরদের যুক্ত করলে সমাজ ও দেশ অত্যন্ত লাভবান হবে। সমাজের এখনো এঁরাই 'মাথা' বা গ্রামীণ ভাষায় খুঁটি। এমনকি জনগণ নির্বাচনের সময়ে তার একান্ত গোপনীয় ভোটটি পর্যন্ত এই গ্রামসভায় মাতব্বর শ্রেণীর পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করে নেয়।

সেদিক থেকে সরকার ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এই লোকজ– ব্যবস্থাটিকে গণযোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। যদি এতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে জনমত সংগঠনের অত্যন্ত বুনিয়াদী ভিত্তি এ থেকে সৃষ্টি হবে।

উপ..ংহার

৮.১. গণযোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে লোক মাধ্যমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বড় দিকটি হল, এর দ্বারা দ্রুত এবং বাস্তবিক অর্থেই জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। মাধ্যমটি যেমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় তেমনি সহজসাধ্য এবং আয়াসসাধ্যও।

৮.২. লোকজ–মাধ্যম একদিকে জনগণকে দিচ্ছে তার বিনোদন, অন্যদিকে লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিও রক্ষা পাচ্ছে এর প্রতি বিদগ্ধজনের সচেতনতার জন্যে। একই সাথে জাতীয় উন্নয়ন প্রচারের বস্তুগত সহয়তা এখান থেকে পাওয়া সম্ভব।

৮.৩. লোকজ মাধ্যম শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার দারিদ্র পীড়িত নিরক্ষর জনগণেরই উপযোগী গণযোগাযোগী মাধ্যম নয়, শহর কিংবা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সকল বিত্তের বাংলা ভাষা-ভাষী, এমনকি যে কোনো ভাষা-ভাষীরই আন্তর্জাতিক মাধ্যম এটি। এ প্রসংগে একটি উদ্ধৃতি স্মর্তব্য-'কেবলমাত্র গ্রামীণ সমাজে কিংবা কম উন্নত স্থানে লোকায়িত মাধ্যমের উপযোগিতা বেশী, একথা সর্বাংশে সত্যি নয় বরং বলা চলে সকল ভাবপ্রবণ ও সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর কাজে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মানব সংযোগ প্রক্রিয়া।'[১৪] আর এই প্রক্রিয়া দুনিয়ার দেশে দেশে এখন শুরু হয়েছে। লোকজ মাধ্যমে জনগণের অনুভূতি সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে (এশীয় দেশগুলোতে) মালয়েশিয়ার নাম অগ্রগণ্যঃ

'Malaysia has also been using folk media or traditional communication media as means of reaching people outside urban area. Since early 1970's, Malaysia Information Deparment has been employing flok media to Communicate development and other message to rurla audiences.....
However, it should be noted that the Malaysian government has yet to utilise the various forms of traditional media in the country.....
..... The fact that rural media are more useful and relevant to the rural people in Mylaysia especially with regard to their development, is yet to be recognised'

৮.৪. বাংলাদেশ সরকারের ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক অধিদপ্তর, বিভাগ ও শাখা রয়েছে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব ও উদ্বুকরণ নিশ্চিত করতে, কৃষি বিভাগের রয়েছে আলাদা তথ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরেরও রয়েছে, মাঠকর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মী, মাদক বিরোধী প্রচার অনুবিভাগ গঠিত হয়েছে অতিসম্প্রতি, পরিবেশ দুষণ মুক্তির প্রচার শাখাও রয়েছে। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ রয়েছে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে। কিন্তু প্রতিটি বিভাগ ও শাখা বাংলাদেশে আলাদা আলাদা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এদের কোনো সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। যে ফলাবর্তন বা জনমত প্রতিক্রিয়া ('ফিডব্যাক') পাওয়া যায় তাও সুমঞ্জস্য না হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে পরিশ্রম অনেক ক্ষেত্রেই পন্ডশ্রমে পরিণত হচ্ছে। একটি সমন্বয় কেন্দ্র তৈরী করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগে বাংলাদেশে লোকজ মাধ্যমগুলিকে সংগঠিত উপায়ে পুনর্বিন্যাস করে কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে এর সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগের সফলতার উপরে।

তথ্যপঞ্জী

১. Many Voices, One World' (সুবিখ্যাত ম্যাকব্রাইড কমিশনের প্রতিবেদন গ্রন্থ) পৃ, ৪৭ – ৬৭।

২. বিশ্বব্যাংকের ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর পঞ্চম দরিদ্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩. Just Faaland, J. R. Parkinson, Bangladesh the Test case of Development, C. Hurst and company and university press limited, Dhaka, 1979,P: 5,197.

৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বর্ষপঞ্জি গ্রন্থ , ১৯৯০,পৃষ্ঠা : ৩,৪।

৫. ঐ' পৃষ্ঠা : ৪

৬. ঐ' পৃষ্ঠা : ৫৫

৭. ঐ' পৃষ্ঠা : ৩৭

৮. ঐ' পৃষ্ঠা : ৫০৩

৯. ঐ' পৃষ্ঠা : ৯৯

১০. ঈমান 'অর্থ সৃষ্টি কর্তার প্রতি বিশ্বাস।

১১. জাতীয় গণমাধ্যম ইনিসটিটিউট , ঢাকায় তথ্য কর্মকর্তাদের কর্মশিবির প্রতিবেদন, ৬ নভেম্বর, ১৯৮৮।

১২. জাতীয় দৈনিকে মফঃস্বল সংবাদের স্থান' শিরোণামের জরীপ,প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ১৯৮১।

১৩. 'আঞ্চলিক সংবাদপত্র ও আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রবাহ'–শীর্ষক জরীপ, প্রেস ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ১৯৮৩।

১৪. Mohd. Hamdan Haji Adnan, 'Rural Media in Malaysia; A New Trend' , The journal of Development communication gune. 1990, p. 75-76.